# আততিবরুন নাবাউই

বর্ষ : ১ | সংখ্যা : ২ | যিলহাজ্জ ১৪৪৭ হি. জুন ২০২৬ মি.



بسم الله الرحمن الرحيم


**আততিববুন নাবাউই**

বর্ষ : ১ | সংখ্যা : ২ | যিলহাজ্জ ১৪৪৭ হি. জুন ২০২৬ মি.

সম্পাদক :
**সলিহ আলগাযী**

সহ সম্পাদক :
**আশরাফ সাইফ**

নির্বাহী সম্পাদক :
**আবদুল্লাহ আল মামুন**

ঠিকানা : চাঁদপুর সদর, চাঁদপুর
যোগাযোগ : 01910833179

নির্ধারিত মূল্য : ১০


"আততিববুন নাবাউই" পাঠকদের চিঠিপত্র এবং যেকোনো পরামর্শকে স্বাগত জানায়। আপনার মতামত পাঠান এই ইমেইলে:

attibbunnabawy@gmail.com

# সূচী


৩। সম্পাদকীয়

৫। হিজামা : একটি প্রাকৃতিক চিকিৎসা ব্যবস্থা

১৪। তালবিনা : বিষণ্নতা ও দুশ্চিন্তা মুক্তির নাবাউই দাওয়াই

১৭। নাবাউই চিকিৎসা এবং ইসলামী চিকিৎসার মধ্যে পার্থক্য

২৪। WHEN A SERVICE IS FREE YOU ARE NOT THE COUSTOMER YOU ARE THE PRODUCT.

৩২। কুরবানীর পশুর চর্বি — নাবীজির যুগে কী করা হতো?

# সম্পাদকীয়

উসতাদ সলিহ আলগাযী

বিসমিল্লাহির রহমানির রহীম

প্রিয় পাঠক,
আল্লাহ তাআলার অশেষ মেহেরবানি এবং আপনাদের উৎসাহ ও ভালোবাসায় "আততিববুন নাবাউই"-র দ্বিতীয় সংখ্যা আপনাদের হাতে তুলে দিতে পারছি। প্রথম সংখ্যার প্রতি আপনাদের যে উষ্ণ সাড়া আমরা পেয়েছি, তা আমাদের দলের প্রতিটি সদস্যের হৃদয়কে আলোড়িত করেছে এবং সামনে এগিয়ে যাওয়ার অনুপ্রেরণা জুগিয়েছে। আল্লাহ আপনাদের সকলকে উত্তম প্রতিদান দিন। আজ থেকে দেড় হাজার বছরেরও আগে, আরবের মরুপ্রান্তরে যিনি দাঁড়িয়ে মানবজাতিকে পথ দেখিয়েছিলেন — তিনি কেবল আধ্যাত্মিক মুক্তির বার্তাই দেননি, বরং শরীর ও স্বাস্থ্যের সুরক্ষায়ও রেখে গেছেন এক অতুলনীয় জ্ঞানভাণ্ডার। সেই জ্ঞানকে ইসলামি পরিভাষায় বলা হয় আততিববুন নাবাউই" — নাবীজির চিকিৎসাবিজ্ঞান।

কিন্তু আজকের পৃথিবীতে আমরা কোথায় দাঁড়িয়ে আছি?

আজ মানুষ এক অদ্ভুত পরাধীনতায় আবদ্ধ। প্রতিটি অসুস্থতায় ছুটতে হয় ওষুধের দোকানে, প্রতিটি ব্যথায় নির্ভর করতে হয় কেমিক্যালের উপর, প্রতিটি রোগের সমাধান খুঁজতে হয় বহুজাতিক ওষুধ কোম্পানির তৈরি কৃত্রিম বড়িতে। অথচ আমাদের চারপাশে ছড়িয়ে আছে আল্লাহর দেওয়া অফুরন্ত প্রাকৃতিক নিয়মাত — কালিজিরা, মধু, জলপাই, খেজুর, হিজামা, রোযার অভ্যাস — যেগুলো সম্পর্কে স্বয়ং রসূলুল্লাহ সল্লল্লহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদের সুস্পষ্ট দিকনির্দেশনা দিয়ে গেছেন।

আমরা নাবীজির সেই দিকনির্দেশনাকে ভুলে গেছি। অথবা বলা ভালো — ভুলিয়ে দেওয়া হয়েছে।

"আততিববুন নাবাউই" কোনো নিছক স্বাস্থ্য-পত্রিকা নয়। এটি একটি আন্দোলনের কণ্ঠস্বর — সেই আন্দোলনের, যা মানুষকে প্রকৃতির কাছে ফেরাতে চায়, নাবীজির সুন্নাতের আলোয় জীবন গড়তে উদ্বুদ্ধ করতে চায়। আমরা বিশ্বাস করি, সুস্থ জীবনযাপনের জন্য মানুষকে অন্ধকারে হাতড়াতে হবে না — কুরআন ও সুন্নাহর পাতায় সেই আলো সুস্পষ্টভাবে জ্বলছে। এই পত্রিকার প্রতিটি সংখ্যায় আমরা চেষ্টা করব নাবীজির চিকিৎসা-পদ্ধতি, প্রাকৃতিক উপাদানের গুণাগুণ, সুস্থ জীবনযাপনের ইসলামী নির্দেশনা এবং আধুনিক বিজ্ঞানের সাথে তার সামঞ্জস্য তুলে ধরতে। কারণ আমরা জানি — যা নাবীজি সল্লল্লহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলে গেছেন, বিজ্ঞান একদিন না একদিন তা স্বীকার করতে বাধ্য হয়।

প্রিয় পাঠক, আপনি শুধু একটি পত্রিকার পাঠক নন — আপনি এই জাগরণের একজন অংশীদার। আপনার পড়া, শেয়ার করা এবং আমাল করার মধ্য দিয়েই এই মিশন প্রাণ পায়। তাই আমাদের আবেদন — কেবল পড়ে রাখবেন না, জীবনে প্রয়োগ করুন এবং আপনার প্রিয়জনদের কাছে পৌঁছে দিন।

আল্লাহ তাআলা আমাদের এই ক্ষুদ্র প্রচেষ্টাকে কবুল করুন, এটিকে উমমাতের জন্য কল্যাণকর করুন এবং নবীজির সুন্নাতকে পুনরুজ্জীবিত করার এই সফরে আমাদের সকলকে সহযাত্রী করুন। আমীন।

وَمَا تَوْفِيقِي إِلَّا بِاللَّهِ

আমার সাফল্য কেবল আল্লাহর পক্ষ থেকেই। — (সূরা হূদ: ৮৮)



## হিজামা কী?

হিজামা (ইংলিশ: Cupping) অনেক আরব ও মুসলিম দেশগুলোতে 'আততিববুন নাবাউই' বা নাবাউই চিকিৎসার অংশ হিসেবে ব্যাপকভাবে ব্যবহৃত হয়ে আসছে। ইবনু সিনা, আয-যাহরাউয়ী এবং আবু বকর আর-রাযীর মতো বিখ্যাত আরব ও মুসলিম চিকিৎসকরা এর সুপারিশ করেছেন। পরবর্তীতে রেনেসাঁ যুগে এটি ইউরোপীয় দেশগুলোতেও বেশ জনপ্রিয়তা লাভ করে।

হিজামাকে বিকল্প চিকিৎসা (Alternative Medicine) হিসেবে গণ্য করা হয়। এই পদ্ধতিতে সাধারণত শরীরের নির্দিষ্ট কিছু পয়েন্টে কাপ বসানো হয় এবং তাপ বা শোষণের (Suction) মাধ্যমে বায়ুমণ্ডলীয় চাপের তুলনায় কম চাপ সৃষ্টি করা হয়। হিজামার মূল উদ্দেশ্য হলো রোগ প্রতিরোধ করা এবং নির্দিষ্ট কিছু রোগের চিকিৎসা করা।

## হিজামার প্রকারভেদ

হিজামাকে প্রধানত নিচের দুটি শ্রেণিতে বিভক্ত করা হয়। এটি মূলত রোগীর শারীরিক অবস্থা, রোগীর ব্যক্তিগত পছন্দ এবং চিকিৎসকের পরামর্শের ওপর ভিত্তি করে নির্ধারণ করা হয়:

• শুষ্ক হিজামা (Dry Cupping): এই পদ্ধতিতে মূলত কাপের মাধ্যমে ত্বকে শুধু শোষন বা টান (Suction) সৃষ্টি করা হয়, কোনো রক্ত বের করা হয় না।

• ভেজা হিজামা বা রক্তমোক্ষণ (Wet Cupping): এই পদ্ধতিতে ত্বকে সামান্য আঁচড় কেটে শোষন বা টান সৃষ্টির মাধ্যমে নির্দিষ্ট পরিমাণ রক্ত বের করে আনা হয়। এটিই সাধারণত 'শিঙা লাগানো' বা 'হিজামা' নামে অধিক পরিচিত।

## হিজামা করার কারণসমূহ

নিচে বর্ণিত স্বাস্থ্যগত সমস্যাগুলো হিজামার মাধ্যমে চিকিৎসা করা সম্ভব:

• পেশি ও কঙ্কালতন্ত্রের ব্যথা: যেমন কোমরের ডিস্ক হার্নিয়েশন (Lumbar Disc Herniation), ঘাড়ের স্পন্ডিলাইটিস (Cervical Spondylosis), রাতে হাতের ঝিনঝিনানি বা ব্যথা (Brachialgia Paraesthetica Nocturna), দীর্ঘস্থায়ী সাধারণ কোমর ব্যথা, ফাইব্রোসাইটিস, দীর্ঘস্থায়ী ঘাড় ব্যথা, ফাইব্রোমায়ালজিয়া, হাঁটুর দীর্ঘস্থায়ী অস্টিওআর্থারাইটিস, তীব্র গাউট বা বাতের ব্যথা এবং ঋতুস্রাবজনিত ব্যথা (Dysmenorrhea)।

• স্নায়বিক রোগ: যেমন সাধারণ মাথাব্যথা, মাইগ্রেন, কার্পাল টানেল সিনড্রোম (Carpal Tunnel Syndrome) এবং তীব্র ট্রাইজেমিনাল নিউরালজিয়া (Trigeminal Neuralgia)।

• বিপাকীয় (Metabolic) রোগ: যেমন তীব্র গেঁটে বাত (Gouty Arthritis) এবং রক্তে উচ্চমাত্রার কোলেস্টেরল ও লিপিড।

• শ্বাসযন্ত্রের রোগ: যেমন অ্যালার্জিক রাইনাইটিস, হাঁপানি (Asthma) এবং ব্রঙ্কাইটিস।

• হৃদরোগ ও রক্তনালীর সমস্যা: যেমন উচ্চ রক্তচাপ (Systolic Hypertension), রক্ত সঞ্চালনের অতিরিক্ত চাপ (Circulatory Overload), হার্ট ফেইলিউর এবং অনিয়মিত হৃদস্পন্দন (Arrhythmia)।

• ভাইরাসজনিত সংক্রমণ: যেমন ভাইরাল হেপাটাইটিস এবং হার্পিস জোস্টার (Herpes Zoster)।

• ব্যাকটেরিয়াজনিত সংক্রমণ।

• অটোইমিউন রোগ: যেমন রিউমাটয়েড আর্থ্রাইটিস (Rheumatoid Arthritis) এবং শ্বেতী রোগ (Vitiligo)।

• সেকেন্ডারি অ্যামেনোরিয়া (মাসিক বন্ধ থাকা)।

• ডায়াবেটিস: হিজামা ইনসুলিন রেজিস্ট্যান্স কমাতে সাহায্য করে।

• স্ট্রোক পুনর্বাসন: স্ট্রোক পরবর্তী রোগীদের শারীরিক সক্ষমতা ফিরিয়ে আনতে।

• চর্মরোগ: যেমন ব্রন (Acne), অ্যাটোপিক ডার্মাটাইটিস এবং দীর্ঘস্থায়ী আর্টিকেরিয়া (Chronic Idiopathic Urticaria)।

## হিজামা করার উপযুক্ত সময়

শুষ্ক হিজামা (Dry Cupping) যেকোনো সময় করা যেতে পারে। তবে ভেজা হিজামা (Wet Cupping) যদি প্রতিরোধের জন্য (অর্থাৎ জরুরি প্রয়োজন ছাড়া) করা হয়, তবে আরবী বা চন্দ্রমাসের ১৭ ১৯ অথবা ২১ তারিখে করা উত্তম। অন্যদিকে, যদি কোনো জরুরি স্বাস্থ্যগত কারণে প্রয়োজন হয়, তবে এটি যেকোনো সময় করা যেতে পারে।

সুস্থতার অবস্থার ওপর ভিত্তি করে হিজামা সেশনের সংখ্যা ভিন্ন হতে পারে। কারো ক্ষেত্রে ১ থেকে ৩টি সেশনের প্রয়োজন হয়, আবার যারা দীর্ঘস্থায়ী (Chronic) রোগে ভুগছেন, তাদের ক্ষেত্রে আরও বেশি সেশনের প্রয়োজন হতে পারে।

## হিজামার উপকারিতা

শরীরের জন্য হিজামার প্রধান উপকারিতাগুলো নিচে তুলে ধরা হলো:

• আরাম ও প্রশান্তি: হিজামা মস্তিষ্কে অভ্যন্তরীণ 'ওপিঅয়েড' (Opioid) উৎপাদন বাড়াতে সাহায্য করে। এটি ব্যথার সহনশীলতা (Pain Threshold) বৃদ্ধি করে ব্যথা নিয়ন্ত্রণে কার্যকর ভূমিকা রাখে। বিশেষ করে পিঠের ব্যথা কমাতে হিজামা অত্যন্ত উপকারী।

• প্রদাহ (Inflammation) হ্রাস: শরীরের বিভিন্ন অংশের প্রদাহ কমাতে এটি সাহায্য করে।

• রক্ত সঞ্চালন বৃদ্ধি ও টক্সিন নিষ্কাশন: রক্ত সঞ্চালন সচল রাখার পাশাপাশি শরীর থেকে বিষাক্ত পদার্থ এবং বর্জ্য বের করে দেয়। এটি ত্বকের কৈশিক জালিকা এবং কোষের মধ্যবর্তী তরল থেকে ক্ষতিকারক উপাদান অপসারণ করে।

• কোষ ও রক্তনালীর মেরামত: এটি কৈশিক জালিকার এন্ডোথেলিয়াল কোষ মেরামতে সাহায্য করে এবং হিজামা করা স্থানে নতুন রক্তনালী গঠনে (Angiogenesis) গতি আনে।

• কোলেস্টেরল নিয়ন্ত্রণ: পুরুষদের ক্ষেত্রে ক্ষতিকর কোলেস্টেরল (LDL) কমাতে এটি ভূমিকা রাখে, যা ধমনীর শক্ত

হওয়া (Atherosclerosis) এবং হৃদরোগ প্রতিরোধে সাহায্য করতে পারে। এছাড়া এটি মোট কোলেস্টেরল এবং ভালো ও খারাপ কোলেস্টেরলের অনুপাত (LDL/HDL Ratio) উন্নত করতে সহায়ক।

• রক্তের উপাদানে পরিবর্তন: হিজামা করা স্থানে লিম্ফোসাইটের (Lymphocytes) সংখ্যা হ্রাস পায় এবং নিউট্রোফিল (Neutrophils) ও লোহিত রক্তকণিকার সংখ্যা বৃদ্ধি পায়।

• টিস্যু পুনর্গঠন: এটি শরীরের অভ্যন্তরীণ টিস্যুর জট বা আঠালোভাব (Adhesions) কমায় এবং সংযোজক কলা (Connective Tissues) পুনরুজ্জীবিত করে।

• স্নায়ুতন্ত্রের ওপর প্রভাব: এটি প্রান্তীয় স্নায়ুতন্ত্রকে (Peripheral Nervous System) উদ্দীপিত করে।

• উচ্চ রক্তচাপ নিয়ন্ত্রণ: রক্তচাপ নিয়ন্ত্রণে রাখতে সাহায্য করে।

• রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা: শরীরের ইমিউন সিস্টেম বা রোগ প্রতিরোধ ব্যবস্থাকে নিয়ন্ত্রণ ও শক্তিশালী করে।

• ডায়াবেটিস নিয়ন্ত্রণ: ডায়াবেটিস রোগীদের রক্তে শর্করার পরিমাণ কমাতে সাহায্য করে।

## হিজামার শর্তাবলি ও নিষেধাজ্ঞা

নিম্নলিখিত ক্ষেত্র বা ব্যক্তিদের জন্য হিজামা করা নিষেধ:

• সংবেদনশীল অঙ্গ ও স্থান: ধমনী, শিরা, স্নায়ু বা লিম্ফ নোড (Glands) আছে এমন স্থানে হিজামা করা যাবে না। এছাড়াও ভ্যারিকোজ ভেইন (Varicose Veins), চর্মরোগ বা ত্বকের ক্ষত আছে এমন স্থানে, চোখের ওপর এবং শরীরের কোনো ছিদ্রপথে হিজামা করা নিষিদ্ধ।

• আঘাতপ্রাপ্ত স্থান: খোলা ক্ষত, হাড়ের ফাটল (Fracture) বা গভীর শিরার রক্ত জমাট বাঁধা (Deep Vein Thrombosis) আছে এমন স্থানে।

• ক্যান্সার আক্রান্ত রোগী।

• কিডনি ও লিভারের রোগে আক্রান্ত ব্যক্তি।

• হৃদরোগী: বিশেষ করে যাদের হার্টেপেসমেকার(Pacemaker) বসানো আছে।

• হিমোফিলিয়া: যাদের রক্ত সহজে জমাট বাঁধে না বা রক্তক্ষরণজনিত সমস্যা আছে।

• তীব্র সংক্রমণ (Acute Infections): যারা বর্তমানে কোনো তীব্র সংক্রমণে ভুগছেন।

• ঔষধের প্রভাব: যারা রক্ত পাতলা রাখার ঔষধ (Anti-coagulants) সেবন করছেন।

• মহিলাদের বিশেষ অবস্থা: গর্ভবতী নারী এবং প্রসব-পরবর্তী সময়ে।

• রক্তস্বল্পতা: যারা অ্যানিমিয়া বা রক্তস্বল্পতায় ভুগছেন।

• শিশু: ৪ বছরের কম বয়সী শিশুদের হিজামা করা যাবে না। ৪ বছরের বেশি বয়সী শিশুদের ক্ষেত্রে হিজামা করার আগে অবশ্যই ডাক্তারের পরামর্শ নিতে হবে এবং তাদের সেশনের সময়কাল খুব সংক্ষিপ্ত হতে হবে।

## হিজামার স্থানসমূহ

নারী ও পুরুষ উভয়ের ক্ষেত্রেই হিজামা করার স্থানগুলো সাধারণত একই হয়ে থাকে। শরীরের গুরুত্বপূর্ণ হিজামা পয়েন্টগুলো নিচে দেওয়া হলো:

• আক্রান্ত টিস্যুর নিকটবর্তী স্থান: রোগ সৃষ্টিকারী উপাদানগুলো শরীর থেকে সহজে বের করে দেওয়ার জন্য আক্রান্ত স্থানের কাছাকাছি হিজামা করা হয়। হিজামার স্থান নির্বাচনের বৈজ্ঞানিক ভিত্তি হলো রোগের মূল উৎস, এর বিস্তৃতি এবং রক্ত ও আন্তঃকোষীয় তরল ফিল্টারিংয়ের মাধ্যমে প্রাপ্ত থেরাপিউটিক সুবিধার ওপর। কাপের অবস্থান পরিবর্তন, সংখ্যা বৃদ্ধি বা আকার পরিবর্তনের মাধ্যমে হিজামার কার্যকারিতা বাড়ানো সম্ভব।

• আল-কাহিল (Al-Kahil): এটি ঘাড়ের নিচে মেরুদণ্ডের সপ্তম কশেরুকার (Cervical Spine) ওপরের অংশ।

• আল-আখদাইন (Al-Akhdayn): ঘাড়ের দুই পাশে কানের পেছনের অংশ।

• দুই কাঁধের মাঝখানে।

• মাথার উপরিভাগ ও তালু: হিজামা করার আগে এই জায়গাগুলোর চুল কামিয়ে নিতে হয় যাতে স্থানটি সঠিকভাবে জীবাণুমুক্ত করা যায়।

• উরু (Thigh)।

• পায়ের উপরিভাগ (Dorsum of the foot)।

## হিজামা করার আগের প্রস্তুতি

হিজামা করার আগে নিম্নলিখিত বিষয়গুলো মেনে চলার পরামর্শ দেওয়া হয়:

• গোসল ও হিজামার সময়ের ব্যবধান: হিজামা করার অন্তত ২ থেকে ৩ ঘন্টা আগে গোসল করা উচিত। হিজামার ঠিক পরপর বা খুব কাছাকাছি সময়ে গোসল না করাই শ্রেয়।

• খাবার গ্রহণ: ভালো ফলাফল পেতে হিজামা করার অন্তত ৩

ঘন্টা আগে থেকে রোজা রাখা (খালি পেটে থাকা) অথবা খুব হালকা খাবার গ্রহণ করার পরামর্শ দেওয়া হয়।

শুষ্ক হিজামা করার পদ্ধতি

শুষ্ক হিজামা করার পদ্ধতিটি নিচে ধাপে ধাপে বর্ণনা করা হলো:

• কাপ স্থাপন ও গরম করা: প্রথমে কাঁচ বা প্লাস্টিকের কাপ ত্বকের ওপর রাখা হয়। এরপর অ্যালকোহল, ভেষজ উদ্ভিদ বা কাগজ ব্যবহার করে কাপের ভেতরে আগুন দিয়ে তাপ দেওয়া হয়।

• ত্বকে স্থাপন: কাপের ভেতরের আগুন সরিয়ে নিয়ে দ্রুত কাপের খোলা মুখটি সরাসরি ত্বকের ওপর বসিয়ে দেওয়া হয়।

• ভ্যাকুয়াম বা শূন্যতা সৃষ্টি: কাপটি ত্বকে বসানোর পর ভেতরের বাতাস ঠান্ডা হতে শুরু করলে একটি শূন্যতা বা ভ্যাকুয়াম তৈরি হয়। এর ফলে ত্বক ও পেশিগুলো কাপের ভেতরের দিকে ওপরের দিকে টেনে ধরে।

• আধুনিক পদ্ধতি: বর্তমানে আধুনিক হিজামা পদ্ধতিতে আগুনের বদলে রাবার পাম্প বা সাকশন মেশিন ব্যবহার করে বায়ুর চাপ তৈরি করা হয়। চাপের পরিবর্তনের ফলে রক্তনালীগুলোর প্রতিক্রিয়ায় ত্বক লাল বর্ণ ধারণ করতে পারে।

• সময়কাল: কাপগুলো সাধারণত ৫ থেকে ১০ মিনিটের জন্য ত্বকের ওপর রাখা হয়।

• মলম ব্যবহার: হিজামা সেশন শেষ হওয়ার পর বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক বা থেরাপিস্ট ওই স্থানে নির্দিষ্ট মলম লাগিয়ে দেন।

• দাগ দূর হওয়া: হিজামার কারণে তৈরি হওয়া কালশিটে বা লাল দাগগুলো সাধারণত ১০ দিনের মধ্যে মিলিয়ে যায়। অনেক সময় আকুপাংচার (Acupuncture) চিকিৎসার সাথেও হিজামা করা হতে পারে।

## ভেজা হিজামা করার পদ্ধতি

• স্থান নির্ধারণ: প্রথমে শরীরের যে স্থানে হিজামা করা হবে সেই জায়গাটি নির্দিষ্ট করা হয়।

• জীবাণুমুক্তকরণ (Sterilization): নির্ধারিত স্থানটি ভালোভাবে জীবাণুমুক্ত করা হয়। সংক্রমণ রোধে এই ধাপটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। হিজামা শেষ হওয়ার পরও পুনরায় এই স্থানটি জীবাণুমুক্ত করা হয়।

• কাপ স্থাপন: শুষ্ক হিজামার মতো করেই প্রথমে কাপটি ত্বকের ওপর বসানো হয়।

• ত্বকে আঁচড় কাটা: একটি জীবাণুমুক্ত সার্জিক্যাল ব্লেড বা ল্যানসেট দিয়ে ত্বকের উপরিভাগে খুব সূক্ষ্ম ও ছোট ছোট (১-২ মিমি লম্বা এবং ০.১ মিমি গভীর) আঁচড় কাটা হয়। ভ্যাকুয়ামের কারণে ত্বকের নিচে জমা হওয়া তরল বের হতে এই আঁচড়গুলো সাহায্য করে।

• পুনরায় শোষণ (Suction): আঁচড় কাটা স্থানে কাপটি পুনরায় বসিয়ে আবার শোষণ বা ভ্যাকুয়াম সৃষ্টি করা হয়। এই পর্যায়ে কাপের ভেতরে রক্তমিশ্রিত এক ধরণের তরল বের হতে দেখা যায়। এই মিশ্রণে ইন্টারস্টিশিয়াল ফ্লুইড (কোষের মধ্যবর্তী তরল), লিম্ফ (লসিকা) এবং ফিল্টার করা কৈশিক তরল থাকে, যা কাপের ভেতরে দ্রুত জমাট বেঁধে যায়।

• ড্রেসিং ও মলম ব্যবহার: কাজ শেষ হলে স্থানটি আবার জীবাণুমুক্ত করে ব্যান্ডেজ বা গজ দিয়ে ঢেকে দেওয়া হয়। ক্ষতস্থান দ্রুত শুকাতে এবং জীবাণুমুক্ত রাখতে অ্যান্টিবায়োটিক মলম বা মধু ব্যবহার করা হয়।

## হিজামা পরবর্তী নিয়মাবলী

হিজামা সেশন শেষ হওয়ার পর নিচের বিষয়গুলো মেনে চলা জরুরি:

• খাদ্যাভ্যাস: পরবর্তী ২৪ ঘন্টা লাল মাংস (গরু, খাসি ইত্যাদি) এবং সব ধরনের দুগ্ধজাত পণ্য এড়িয়ে চলুন। এর পরিবর্তে মাছ, ডিম, ফলমূল এবং শাকসবজি খেতে পারেন। অল্প পরিমাণে মুরগির মাংস খাওয়া গেলেও তা এড়িয়ে চলাই উত্তম।

• পানীয়: পরবর্তী ২৪ ঘন্টা ক্যাফেইনযুক্ত পানীয় (চা, কফি) এবং কোমল পানীয় (Soft drinks) পান করা থেকে বিরত থাকুন।

• হাইড্রেশন: শরীরকে আর্দ্র রাখতে প্রচুর পরিমাণে মিনারেল ওয়াটার বা বিশুদ্ধ পানি এবং গ্রিন টি পান করুন, যা স্বাস্থ্যের জন্য খুবই উপকারী।

• ধূমপান: সম্ভব হলে পরবর্তী ২৪ ঘন্টা সব ধরনের তামাকজাত পণ্য বা ধূমপান বর্জন করুন।

• শারীরিক পরিশ্রম: হিজামা করার পর অন্তত ৪৮ ঘন্টা ভারী ব্যায়াম, কঠোর পরিশ্রম বা শারীরিক সম্পর্ক (সহবাস) থেকে বিরত থাকুন।

• গোসল: সংক্রমণের ঝুঁকি এড়াতে হিজামা করার পর অন্তত ২৪ ঘন্টা সংশ্লিষ্ট স্থানে পানি লাগানো বা গোসল করা থেকে বিরত থাকুন (যদিও হিজামার

আগে ও পরে জায়গাটি জীবাণুমুক্ত করা হয়)।

• ত্বকের যত্ন: হিজামা করা স্থানে পরবর্তী দুই থেকে তিন সপ্তাহ দিনে অন্তত দুইবার করে অলিভ অয়েল বা জয়তুন তেল মালিশ করুন।

## হিজামার পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া ও ক্ষতিকর দিক

হিজামা সাধারণত একটি নিরাপদ চিকিৎসা পদ্ধতি হিসেবে পরিচিত হলেও, এর ফলে নিচের পার্শ্বপ্রতিক্রিয়াগুলো দেখা দিতে পারে:

• ত্বকের দাগ বা ক্ষত চিহ্ন (Scars)।

• পোড়া ভাব (Burns): বিশেষ করে আগুনের সাহায্যে করা শুষ্ক হিজামার ক্ষেত্রে।

• মাথাব্যথা ও চুলকানি।

• মাথা ঘোরা, ক্লান্তি এবং পেশি সংকোচন (Muscle cramps)।

• রক্তস্বল্পতা ও বমি বমি ভাব (Nausea)।

• ফোস্কা পড়া (Blisters): ত্বকের ওপর ছোট ছোট পানির পুটলি তৈরি হওয়া।

• ছোট রক্ত পিণ্ড (Hematoma): ত্বকের নিচে রক্ত জমাট বেঁধে ফুলে যাওয়া।

• ব্যথা: হিজামা করার স্থানে সাময়িক ব্যথা অনুভব হওয়া।

• ফোড়া (Abscess) বা ত্বকের সংক্রমণ (Infections)।

• হাইপার-পিগমেন্টেশন: ত্বকের নির্দিষ্ট স্থান কালচে হয়ে যাওয়া।

• ভ্যাসোভ্যাগাল অ্যাটাক (Vasovagal Syncope): রক্তচাপ হঠাৎ কমে গিয়ে সাময়িক অজ্ঞান হওয়া বা দুর্বল বোধ করা।

• শরীরে তাপ ও ঘাম: হিজামা চলাকালীন রক্তনালী প্রসারণের ফলে প্রথমে শরীরে উষ্ণতা অনুভব হওয়া এবং পরে ঘাম দিয়ে শরীর ঠান্ডা হয়ে যাওয়া।

• আয়রনের ঘাটতি: কিছু ক্ষেত্রে হিজামা সেশনের পর শরীরের আয়রন স্টোরেজ বা 'ফেরিটিন' (Ferritin) লেভেল কমে যেতে পারে।

## নারীদের জন্য হিজামার উপকারিতা এবং গর্ভধারণে এর প্রভাব

বিভিন্ন গবেষণায় নারীদের জন্য হিজামার কার্যকারিতা উঠে এসেছে। ২০১৩ সালের সেপ্টেম্বর থেকে ২০১৫ সালের মে মাস পর্যন্ত কিং আবদুল আজিজ হাসপাতালে একটি ক্লিনিকাল স্টাডি পরিচালিত হয়। এই গবেষণার উদ্দেশ্য ছিল নারী বন্ধ্যাত্বের চিকিৎসায় ভেজা হিজামার (Wet Cupping) কার্যকারিতা মূল্যায়ন করা।

• গবেষণার বিবরণ: এই গবেষণায় ২০ থেকে ৫০ বছর বয়সী ৫০ জন নারী অংশগ্রহণ করেন, যারা ১ থেকে ২২ বছর ধরে বন্ধ্যাত্বজনিত সমস্যায় ভুগছিলেন। হিজামার পর তাদের গর্ভধারণের হার এবং প্রজনন হরমোনের মাত্রা পরিমাপ করা হয়।

• ফলাফল: গবেষণায় অংশগ্রহণকারী নারীদের মধ্যে ১২ জন হিজামা চিকিৎসার পর সফলভাবে গর্ভধারণ করেন। এর মধ্যে ৭ জন নারী মাত্র এক বা দুই সেশন হিজামা করার পরেই গর্ভধারণ করেন। এছাড়া হিজামার আগে ও পরে প্রজনন হরমোনের মাত্রায় উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন লক্ষ্য করা গেছে।

• সতর্কতা: যদিও এই গবেষণার ফলাফল ইতিবাচক ছিল, তবে এই ফলাফলগুলো নিশ্চিত করার জন্য আরও বিস্তারিত গবেষণার প্রয়োজন রয়েছে।

## পুরুষ বন্ধ্যাত্ব ও দম্পতির ওপর প্রভাব

অন্য একটি গবেষণায় ৩২ বছর বয়সী একজন পুরুষের ওপর ভেজা হিজামার প্রভাব দেখা হয়, যিনি ৭ বছর ধরে বন্ধ্যাত্ব এবং দ্রুত বীর্যপাত সমস্যায় ভুগছিলেন। পরীক্ষার শুরুতে তার শুক্রাণুর সংখ্যা কম, দুর্বল গতিশীলতা এবং অস্বাভাবিক গঠন লক্ষ্য করা যায়।

• চিকিৎসা ও ফলাফল: ওই ব্যক্তিকে মাসে দুবার মেরুদণ্ডের ৯টি পয়েন্টে ভেজা হিজামা দেওয়া হয় এবং তার স্ত্রীকে মাসে একবার হিজামা দেওয়া হয়। হিজামার ফলে ওই ব্যক্তির শুক্রাণুর সংখ্যা বৃদ্ধি পায় এবং শুক্রাণুর গতিশীলতা উন্নত হয়। চিকিৎসার দুই মাস পর তার স্ত্রী সফলভাবে গর্ভধারণ করেন।

***

সূত্র :

https://altibbi.com/%D9%85%D8%B5%D8%B7%D9%84%D8%AD%D8%A7%D8%AA-%D8%B7%D8%A8%D9%8A%D8%A9/%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AF%D9%8A%D9%84/%D8%AD%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%A9



## তালবিনা: বিষণ্নতা ও দুশ্চিন্তা মুক্তির নাবাউই দাওয়াই

নাবী কারীম সল্লল্লহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নির্দেশিত তালবিনা যা কেবল হৃদয়ে প্রশান্তিই আনে না, বরং বিষণ্নতা প্রতিরোধ করে। এটি পাকস্থলীর সমস্যা ও পেট ব্যথা নিরাময়ে অত্যন্ত কার্যকর এবং ওজন কমাতে, বিশেষ করে ডায়াবেটিস রোগীদের ইনসুলিন সক্রিয় করতে সাহায্য করে।

### প্রয়োজনীয় উপকরণ:

১. আস্ত যবের আটা: যব ভালো করে ধুয়ে শুকিয়ে নিয়ে কফি মেশিনে বা জাঁতায় পিষে নিতে পারেন।
২. পানি: ১ কাপ বা ২০০ গ্রাম।
৩. অনুপাত: ২০০ গ্রাম পানির জন্য আধা কাপ যবের আটা ব্যবহার করতে হবে।
৪. মধু: প্রাকৃতিক ও খাঁটি মধু।
৫. আখরোট: ব্রেন বা মস্তিষ্কের কার্যকারিতা বাড়ানোর জন্য এতে আখরোট মেশাতে পারেন (মরক্কোতে একে 'কারকা' বলা হয়)

### প্রস্তুত প্রণালী:

- প্রথমে একটি পাত্রে যবের আটা ও পানি মিশিয়ে নিন।

- চুলায় একেবারে হালকা আঁচে বসিয়ে দিন।
- টানা ১৫ থেকে ১৮ মিনিট নাড়তে থাকুন যতক্ষণ না এটি ঘন ও থকথকে হয়ে আসে।

**সতর্কতা:** আগুনের আঁচ বাড়িয়ে দিলে এটি দ্রুত রান্না হয়ে যাবে ঠিকই, কিন্তু যবের আটা কাঁচা থেকে যাবে এবং মুখে বিস্বাদ লাগবে। ধীর আঁচে রান্না করলেই এর সঠিক স্বাদ ও গুণ পাওয়া যাবে।

**স্বাস্থ্যগত উপকারিতা:**

মানসিক স্বাস্থ্য: এতে থাকা মেলাটোনিন স্নায়ুকে শান্ত রাখে এবং রাতে ঘুমানোর আগে এক কাপ তালবিনা খেলে চমৎকার ঘুম হয়। এটি মেজাজ ভালো রাখতে এবং স্মৃতিশক্তি বৃদ্ধিতে সহায়ক।

**শারীরিক সুস্থতা:** এটি শরীরের রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা (immune system) বৃদ্ধি করে কারণ এতে রয়েছে ম্যাগনেসিয়াম এবং ভিটামিন বি২। এছাড়াও এটি শরীর থেকে দূষিত পদার্থ বের করে দিতে এবং মূত্রাশয় পরিষ্কার করতে সাহায্য করে।

**ত্বক ও চুল:** নিয়মিত সেবনে ত্বক ও চুলের সৌন্দর্য বৃদ্ধি পায়।

**শিশু ও নারীদের জন্য:** হাইপার-অ্যাক্টিভ শিশু বা যাদের মনযোগের অভাব রয়েছে এবং অটিজমে আক্রান্ত শিশুদের জন্য এটি অত্যন্ত উপকারী। নারীদের ক্ষেত্রে এটি ডিম্বাশয় সক্রিয় করতে এবং ঋতুস্রাবের সমস্যা সমাধানে সাহায্য করে।

كان إذا أخذ أهلَه الوَعَكُ أمر بالحساءِ فصُنِعَ ، ثمَّ أمرهم فحَسَوْا ، و كان يقول : إنَّهُ ليرتو فؤادَ الحزينِ ، و يَسْرُو عن فؤادِ السقيمِ ، كما تَسْرُو إحداكُنَّ الوسخَ بالماءِ عن وجهِها

আয়িশা রদিয়াল্লাহু আনহা বলেন—

রসূলুল্লাহ সল্লল্লহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পরিবারের কেউ অসুস্থ হলে তিনি যবের স্যুপ (তালবিনা) তৈরির নির্দেশ দিতেন। তিনি বলতেন, এটি শোকার্ত হৃদয়ে প্রশান্তি আনে এবং অসুস্থ ব্যক্তির হৃদয়ের কষ্ট দূর করে, ঠিক যেমন তোমরা পানি দিয়ে মুখমণ্ডল ধুয়ে ময়লা পরিষ্কার করো।

خلاصة حكم المحدث : صحيح الراوي : عائشة أم المؤمنين | المحدث : الألباني | المصدر : صحيح الجامع | الصفحة أو الرقم : 4646 التخريج : أخرجه الترمذي (2039)، | والنسائي في ((السنن الكبرى)) (7573)، وابن ماجه (3445)، وأحمد (24035) باختلاف يسير

এখানে 'প্রশান্তি' বলতে হৃদয়কে শক্তিশালী করা বোঝানো হয়েছে।

তালবিনা কেবল একটি খাবার নয়, এটি সুস্থ থাকার একটি প্রাকৃতিক ও ঐশী পদ্ধতি। সুস্থ মন ও শরীরের জন্য আপনার খাদ্যতালিকায় আজই এটি যুক্ত করুন।

# নাবাউই চিকিৎসা এবং ইসলামী চিকিৎসার মধ্যে পার্থক্য

মূল : সাইয়িদ সালাহ উদ্দীন আহমাদ | অনুবাদ : উসতাদ সলিহ আলগাযী

আমার নাম সাইয়িদ সালাহ উদ্দীন আহমাদ। আমি ওরিয়েন্টাল মেডিসিন (প্রাচ্য চিকিৎসা পদ্ধতি)-এর একজন চিকিৎসক। গত ২২ বছর ধরে আমি ট্র্যাডিশনাল চাইনিজ মেডিসিন (ঐতিহ্যবাহী চীনা চিকিৎসা), ন্যাচারোপ্যাথিক মেডিসিন (প্রাকৃতিক চিকিৎসা), ফাংশনাল মেডিসিন, ভেষজ চিকিৎসা (হারবাল মেডিসিন), ডায়েটারি থেরাপী (খাদ্য নিয়ন্ত্রণ চিকিৎসা), আকুপাংচার, হিজামা (রক্তমোক্ষণ), প্রফেট বা নাবাউই চিকিৎসা এবং আরও অনেক কিছু নিয়ে প্র্যাকটিস করছি।

কয়েক বছর ধরে আমার ক্লিনিকে আসা অনেক রোগী আমাকে এই ধরনের একটি চ্যানেল খোলার পরামর্শ দিচ্ছিলেন। কারণ সততার সাথে বলতে গেলে, নাবাউই এবং ইসলামিক চিকিৎসা হলো দিকনির্দেশনার এক বিশাল রত্নভাণ্ডার, যা কেবল উন্মোচিত হওয়ার এবং মানবকল্যাণে ব্যবহৃত হওয়ার অপেক্ষায় রয়েছে। তাই আজ আপনাদের সামনে এটি উপস্থাপন করতে পেরে আমি সত্যিই রোমাঞ্চিত।

আপনারা জানেন, আমি যখন রোগী এবং সাধারণ মানুষের সাথে কথা বলি, তখন প্রায়শই অনেকেই 'নাবাউই চিকিৎসা' (Prophetic Medicine) এবং 'ইসলামিক চিকিৎসা' (Islamic Medicine) শব্দ দুটিকে একই অর্থে ব্যবহার করেন। কিন্তু আসলে এই দুটি এক নয়। এমনকি কখনো কখনো মানুষের এই বিষয়ে স্পষ্ট ধারণাও থাকে না যে, এগুলোর প্রকৃত সংজ্ঞা কী।

চলুন, একদম প্রাথমিক বিষয় দিয়ে শুরু করা যাক:

## নাবাউই চিকিৎসা (Prophetic Medicine)

ভাই ও বোনেরা, বিষয়টি পরিষ্কার করার জন্য বলছি—নাবাউই চিকিৎসা বলতে মূলত সেই সমস্ত সাহিত্য, নথিবদ্ধ বাণী (হাদীস), কর্ম এবং মহানাবী হযরত মুহাম্মাদ সল্লল্লহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের অনুমোদনকে বোঝায়, যা স্বাস্থ্য এবং

রোগব্যাধি সম্পর্কিত এবং যা বিভিন্ন হাদীস ও জীবনীগ্রন্থে (সীরাত) পাওয়া যায়।

এখানে একটি বিষয় লক্ষ্য করা গুরুত্বপূর্ণ যে, 'নাবাউই চিকিৎসা' বা 'তিববুন নাবাউই' শব্দটি কিন্তু রসূলুল্লাহ সল্লল্লহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জীবদ্দশায় ব্যবহৃত কোনো পরিভাষা ছিল না। প্রকৃতপক্ষে, এই পরিভাষাটি সর্বপ্রথম যিনি ব্যবহার করেছিলেন তিনি হলেন ইমাম আলী আল-রিদা (যিনি রসূলুল্লাহ সল্লল্লহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ওয়াফাতের বা হিজরতের প্রায় ১৯০ বছর পর জীবিত ছিলেন)। তিনিই প্রথম এই শব্দটির ব্যবহার শুরু করেন।

এরপর, আমাদের অনেক দর্শকই হয়তো জানেন যে, হাদীস সংগ্রাহক এবং জীবনীকারগণ রসূলুল্লাহ সল্লল্লহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বাণী বা হাদীসগুলোকে বিভিন্ন শ্রেণীতে বিন্যস্ত করতেন। আর এই শ্রেণীবিভাগ করতে গিয়েই তারা 'তিববুন নাবাউই' বা নাবাউই চিকিৎসা পরিভাষাটি নিয়ে আসেন। পরবর্তীতে অন্যান্য বিখ্যাত লেখক, যেমন—ইমাম আল-যাহাবী, ইবনুল কাইয়িম (যিনি নাবাউই চিকিৎসার ওপর একটি অত্যন্ত বিখ্যাত গ্রন্থ লিখেছেন যা আজও সমান জনপ্রিয়)—তারা এই পরিভাষাটি ব্যবহার করতে শুরু করেন। এছাড়া ইমাম মাকদিসি, ইমাম নুরুদ্দিন জাজারের মতো ইমামগণও নাবাউই চিকিৎসার ওপর বিভিন্ন গ্রন্থ ও প্রবন্ধ লিখেছেন এবং এই পরিভাষাটি ব্যবহার করেছেন।

এখন আমাদের সকলের জন্য এটি জানা অত্যন্ত জরুরি যে, মুসলিম স্কলার বা পন্ডিতগণ নাবাউই চিকিৎসার মূলনীতি এবং অনুশীলনগুলোকে সমস্ত বিশ্বাসীদের জন্য নির্ভরযোগ্য, অবশ্য পালনীয় এবং কল্যাণকর বলে মনে করেন। আর এর কারণ কী? কারণ এটি কোনো খেয়ালখুশি বাঅনুমানেরওপরভিত্তিকরেতৈরিনয়,বরং এটি সরাসরি ঐশী বাণী বা 'ওয়াহী'র ওপর নির্ভরশীল।

এই প্রসঙ্গে পবিত্র কুরআন কী বলে তা যদি আমরা লক্ষ্য করি, তবে দেখব মহামহিম ও সর্বোচ্চ আল্লাহ কুরআনে এরশাদ করেছেন:

> "আর তিনি নিজের ইচ্ছা বা খেয়ালখুশি থেকে কোনো কথা বলেন না। এটি তো কেবল ওয়াহী, যা তাঁর প্রতি প্রত্যাদেশ হয়।" (সূরা আন-নাজম: ৩-৪)

এবং অন্য একটি আয়াতে বলা হয়েছে:

> "নিশ্চয়ই আল্লাহর রসূলের মধ্যে তোমাদের জন্য উত্তম আদর্শ রয়েছে—ঐ ব্যক্তির জন্য, যে আল্লাহ ও শেষ দিবসের আশা রাখে এবং আল্লাহকে অধিক স্মরণ করে।" (সূরা আল-আহজাব: ২১)

এবং আরও একটি আয়াতে কুরআনে উল্লেখ করা হয়েছে:
> "রসূল তোমাদের যা দেন তা তোমরা গ্রহণ করো, আর যা থেকে তোমাদের নিষেধ করেন তা থেকে বিরত থাকো।" (সূরা আল-হাশর: ৭)

সুতরাং, এগুলোই হলো কিছু মৌলিক আয়াত যা অধিকাংশ বা সকল আলিমদের মতে এই বিষয়ের প্রমাণ ও দলিল যে—তিনি (রসূলুল্লহ) আমাদের জন্য যা কিছু নিয়ে এসেছেন তা নির্ভরযোগ্য এবং আমাদের জন্য কল্যাণকর। তাই আমাদের এই বিষয়টি মনে রাখা উচিত।
আমাদের কিছু দর্শক হয়তো ভাবছেন যে, রসূলুল্লাহ সল্লল্লহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের এমন কিছু বাণীর ব্যাপারে কী বলা হবে যেখানে তিনি নিজেই বলেছিলেন যে, তিনি ওয়াহীর ভিত্তিতে নয়, বরং নিজের ব্যক্তিগত মতামতের ভিত্তিতে কথা বলছেন?

হ্যাঁ, এমন কিছু বিরল ঘটনা ঘটেছে, এটি সত্য। তবে পয়েন্ট হলো—সেগুলো ছিল নিয়মের ব্যতিক্রম (Exceptions) এবং রসূলুল্লাহ সল্লল্লহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিজেই সেগুলো স্পষ্ট করে দিয়েছিলেন। উদাহরণস্বরূপ, 'নাকলা' (খেজুর গাছ) সংক্রান্ত একটি বিখ্যাত হাদীস রয়েছে, যেখানে খেজুর গাছের কলম করা এবং পরাগায়ন নিয়ে বলা হয়েছিল।(১) এই নির্দিষ্ট ঘটনায় রসূলুল্লাহ সল্লল্লহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সাহাবীদের উদ্দেশ্যে বলেছিলেন যে, জাগতিক বা পার্থিব বিষয়ে তারা তাঁর চেয়ে বেশি জ্ঞানী। এর মানে এই নয় যে তাঁর বলা বাকি সব কথা ওয়াহীর ওপর ভিত্তি করে ছিল না। ওটি কেবল একটি ব্যতিক্রমী ঘটনা ছিল।

একইভাবে আরেকটি উদাহরণ হলো—বদর যুদ্ধের ঘটনায় রসূলুল্লাহ সল্লল্লহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কিছু যুদ্ধবন্দীদের মুক্তিপণ নেওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন। কিন্তু পরবর্তীতে কুরআনের আয়াত নাজিল করে আল্লাহ তাঁকে সংশোধন করে দেন। তবে এই ক্ষেত্রেও রসূলুল্লাহ সল্লল্লহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম স্পষ্ট করেছিলেন যে, তিনি ওয়াহীর ভিত্তিতে নয়, বরং নিজের মতামতের ভিত্তিতে সেই সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন। সুতরাং, এগুলো ছিল মূল নিয়মের বাইরে কিছু ব্যতিক্রমী ঘটনা। অধিকাংশ আলিম এবং উমমাহর ঐকমত্য (ইজমা) হলো—স্বাস্থ্য ও রোগব্যাধি সম্পর্কিত তাঁর বাণীগুলোও বিশ্বাসীদের জন্য সমানভাবে নির্ভরযোগ্য ও অনুসরণীয়।

বিষয়টি ভাবলে সত্যিই অবাক লাগে যে, ১৪০০ বছরেরও বেশি সময় আগে পৃথিবীতে বসবাস করে যাওয়া একজন মানুষের আজকে এই পৃথিবীতে ১৮০ কোটিরও বেশি অনুসারী রয়েছে, যারা তাদের জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে রসূলুল্লাহ সল্লল্লহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে আদর্শ হিসেবে মেনে চলে। আজকাল আমাদের অনেক জনপ্রিয় ইনফ্লুয়েন্সার, ইউটিউব

চ্যানেল এবং সেলিব্রিটি রয়েছেন—তারা মাত্র এক বা দুই মিলিয়ন (১০-২০ লাখ) অনুসারী পেলেই খুশি হয়ে যান। কিন্তু এই ক্ষেত্রে, রসূলুল্লাহ সল্লল্লহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রায় প্রতিটি বিষয়ে ১৮০ কোটিরও বেশি মানুষ তাঁকে অনুসরণ করছে। তাই এটি আমাদের গভীরভাবে ভাবার মতো একটি বিষয়। এমনকি আপনি যদি মুসলিম না-ও হন বা অন্য কোনো ধর্মের অনুসারী হন, তবুও এটি নিয়ে ভাবার অবকাশ রয়েছে; কারণ তাঁর দেওয়া দিকনির্দেশনা তখনকার মতো আজও সমভাবে কার্যকর।

সুতরাং, রসূলুল্লাহ সল্লল্লহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নির্দেশনা কেবল আধ্যাত্মিক বিষয়ের মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল না, বরং তা শারীরিক এবং মানসিক স্বাস্থ্যের জন্যও ছিল। আমাদের এটি মনে রাখতে হবে। প্রকৃতপক্ষে, তাঁর নির্দেশনা একই সাথে তিনটি স্তরে—অর্থাৎ শারীরিক, মানসিক এবং আধ্যাত্মিক ক্ষেত্রে উপকার নিশ্চিত করে।

আপনাদের একটি উদাহরণ দেই; আমরা মুসলিম হিসেবে সবাই জানি যে তিনি আধ্যাত্মিক দিকনির্দেশনা দিয়েছেন, কিন্তু শারীরিক স্বাস্থ্যের ক্ষেত্রেও তাঁর অধিকাংশ নির্দেশনা ছিল ঐশী ওয়াহীর ওপর ভিত্তি করে। সহজ একটি উদাহরণ হিসেবে—একটি বিখ্যাত হাদীস রয়েছে, যেখানে একজন সাহাবী রসূলুল্লাহ সল্লল্লহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে এসে তাঁর ভাইয়ের পেটের অসুখ বা ব্যথার অভিযোগ করলেন। রসূলুল্লাহ সল্লল্লহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে নির্দেশ দিলেন, "তাকে মধু পান করাও।" তিনি গিয়ে তা করলেন। ফিরে এসে বললেন যে, অবস্থার কোনো উন্নতি হয়নি।(২) রসূলুল্লাহ সল্লল্লহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দ্বিতীয়বারও একই কথা বললেন। এবারও সুস্থ হলো না। তৃতীয়বারও একই ঘটনা ঘটল। রসূলুল্লাহ সল্লল্লহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে মধুই খাওয়াতে বলতে থাকলেন। যখন চতুর্থবার এলো, তিনি তাকে আবারও মধু খাওয়াতে বললেন এবং এরপর আল্লাহর ইচ্ছায় সে সম্পূর্ণ সুস্থ হয়ে গেল। কিন্তু এই হাদীসের সবচেয়েআকর্ষণীয়অংশটিহলো,রসূলুল্লাহ সল্লল্লহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছিলেন: "আল্লাহ সত্য বলেছেন, কিন্তু তোমার ভাইয়ের পেট মিথ্যা বলেছে।" সুতরাং, হাদীসের এই ঘটনাটি প্রমাণ করে যে, তাঁর এই চিকিৎসা পদ্ধতি ওয়াহীর ওপর ভিত্তি করেই ছিল, নিজের কোনো মনগড়া মতামত ছিল না।

আরেকটি চমৎকার উদাহরণ দেওয়া যায় হিজামা (Hijama) সংক্রান্ত একটি বর্ণনা থেকে। একটি বর্ণনায় উল্লেখ আছে যে, রসূলুল্লাহ সল্লল্লহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন মিরাজের রাতে (ইসরা ও মিরাজ) গিয়েছিলেন, তখন যে ফেরেশতাদের সাথে তাঁর সাক্ষাৎ হয়েছিল, তারা তাঁকে বলেছিলেন: "আপনার উমমাতকে হিজামা করার নির্দেশ দিন।"(৩) সুনানে ইবনে মাজাহ-তে বর্ণিত এটি অত্যন্ত সুন্দর

একটি হাদীস, যেখানে রসূলুল্লাহ সল্লল্লহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিজের উমমাতকে হিজামা করার নির্দেশ দিয়েছেন এবং এটিও ওয়াহীর ওপর ভিত্তি করেই ছিল।

## ইসলামিক চিকিৎসা (Islamic Medicine)

এতক্ষণ নাবাউই চিকিৎসার পরিচয় দেওয়ার পর, এখন প্রশ্ন আসে—ইসলামিক চিকিৎসা কী? এটি বেশ দীর্ঘ একটি বিষয়, তবে আমি আপনাদের সবচেয়ে সহজ এবং সংক্ষিপ্ত একটি সংজ্ঞা দিচ্ছি। এই সংজ্ঞাটি তৈরি করেছে 'ইসলামিক মেডিকেল অ্যাসোসিয়েশন অফ নর্থ আমেরিকা' (IMANA)। তাদের দেওয়া সংক্ষিপ্ত সংজ্ঞা অনুযায়ী:

> "ইসলামিক চিকিৎসা হলো ইসলামের ঐশী শিক্ষার সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ এবং তার পরিপূরক হিসেবে গড়ে ওঠা সবচেয়ে আধুনিক চিকিৎসা বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির সমন্বিত রূপ।"

সুবহানাল্লাহ! সুতরাং, এখানে লক্ষ্য করার মতো বিষয় হলো—নাবাউই চিকিৎসার তুলনায় ইসলামিক চিকিৎসা অনেক বেশি ব্যাপক ও বিস্তৃত একটি ব্যবস্থা। কারণ এটি এমন একটি ব্যবস্থা যা আধুনিক চিকিৎসা বিজ্ঞানের অগ্রগতি, জ্ঞান এবং প্রযুক্তিকে ক্রমাগত নিজের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত করে চলেছে। অন্যদিকে, নাবাউই চিকিৎসা মূলত রসূলুল্লাহ সল্লল্লহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সময়কালের তাঁর কর্ম এবং বাণীর মধ্যেই সীমাবদ্ধ। তাই আপনারা নিশ্চয়ই বুঝতে পারছেন যে ইসলামিক চিকিৎসার পরিধি কতটা বিশাল।

নাবাউই চিকিৎসার প্রতিটি অংশই ইসলামিক চিকিৎসার অন্তর্ভুক্ত। কিন্তু ইসলামিক চিকিৎসার সবকিছুই আবার নাবাউই চিকিৎসার অংশ নয়। আমি আপনাদের কয়েকটি উদাহরণ দেই।
আমরা জানি কীভাবে রসূলুল্লাহ সল্লল্লহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কালোজিরাকে মৃত্যু ছাড়া সমস্ত রোগের নিরাময় হিসেবে সুপারিশ করেছেন। এটি রসূলুল্লাহ সল্লল্লহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের একটি প্রমাণিত বাণী। তাই এটি নববী চিকিৎসার অংশ এবং স্বাভাবিকভাবেই ইসলামিক চিকিৎসারও অংশ।

তবে, আমরা যদি পরবর্তী সময়ের মুসলিম চিকিৎসকদের দিকে তাকাই—যেমন অত্যন্ত বিখ্যাত চিকিৎসক ইবনে সিনা (পশ্চিমে যিনি অ্যাভিসেনা নামে পরিচিত) —তিনি বিষণ্নতা বা ডিপ্রেশনের জন্য জাফরান ব্যবহারের এবং হজমের সমস্যার জন্য পুদিনা পাতা ব্যবহারের পরামর্শ দিয়েছিলেন। এখন, এটিকে কিন্তু 'নাবাউই চিকিৎসা'র অংশ বলা যাবে না, কারণ এটি রসূলুল্লাহ সল্লল্লহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের থেকে আসেনি এবং এটি অনেক পরে আবিষ্কৃত হয়েছে। কিন্তু তা সত্ত্বেও, এটি

ইসলামের কোনো মূলনীতির সাথে সাংঘর্ষিক নয়।

একইভাবে, আমাদের দর্শকরা হয়তো 'ইউনানিচিকিৎসা'(UnaniMedicine)-র নাম শুনে থাকবেন, যার অনুবাদ হলো গ্রীক চিকিৎসা। এটি ইতিহাসের এক চমৎকার মোড় ছিল, যেখানে মুসলিম চিকিৎসকরা ঐতিহ্যবাহী গ্রীক চিকিৎসার এমন কিছু দিক গ্রহণ ও পরিমার্জন করেছিলেন যা ইসলামিক শিক্ষার সাথে সাংঘর্ষিক ছিল না। উদাহরণস্বরূপ—ইউনানি চিকিৎসায় অত্যন্ত জনপ্রিয় ও সুপরিচিত 'চারটি হিউমার' বা তরল উপাদান (রক্ত, কফ, পিত্ত বা হলুদ পিত্ত এবং কৃষ্ণ পিত্ত)—এগুলো ইউনানি চিকিৎসার অংশ। এগুলো নাবাউই চিকিৎসার অংশ নয়, তবে এগুলোকে এমন কিছু উপাদান হিসেবে গণ্য করা যায় যা ইসলামিক চিকিৎসক এবং ইসলামিক চিকিৎসা ব্যবস্থা সময়ের সাথে সাথে গ্রহণ করে নিয়েছে।

সবশেষে আরেকটি উদাহরণ দেওয়া যাক—মুসলিম চিকিৎসক আল-জাহরাভি ফোরসেপ (Forceps), সার্জিক্যাল হুক (Surgical hooks) এবং হাড় কাটার করাতসহ বহু ধরনের চিকিৎসা সরঞ্জাম ও যন্ত্রপাতি উদ্ভাবন করেছিলেন। এগুলোকে অবশ্যই ইসলামিক চিকিৎসার অংশ বলা যায়, কিন্তু এগুলো নাবাউই চিকিৎসার অংশ নয়।

(১)

مَرَرتُ مع رَسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم بقَومٍ على رُؤوسِ النَّخلِ، فقال: ما يَصنَعُ هؤلاء؟ فقالوا: يُلَقِّحونَه؛ يَجعَلونَ الذَّكَرَ في الأُنثى فيَلقَحُ، فقال رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: ما أظُنُّ يُغني ذلك شيئًا، قال: فأُخبِروا بذلك فتَرَكوه، فأُخبِرَ رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم بذلك، فقال: إن كان يَنفَعُهم ذلك فليَصنَعوه؛ فإنِّي إنَّما ظَنَنتُ ظَنًّا، فلا تُؤاخِذوني بالظَّنِّ، ولَكِن إذا حَدَّثتُكُم عَنِ اللهِ شيئًا فخُذوا به؛ فإنِّي لَن أكذِبَ على اللهِ عَزَّ وجَلَّ.

الراوي : طلحة بن عبيدالله | المحدث : مسلم | المصدر : صحيح مسلم

الصفحة أو الرقم: 2361 | خلاصة حكم المحدث : [صحيح]

التخريج : أخرجه مسلم (2361 ) واللفظ له، وابن ماجه (2470)، وأحمد (1395) كلاهما باختلاف يسير

(২)

جاءَ رَجُلٌ إلى النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم فقال: إنَّ أخي استَطلَقَ بَطنُه، فقال رَسولُ

(٥)

ما مررتُ ليلةَ أُسرِيَ بي بملإٍ ، من الملائكةِ إلا قالوا : يا محمدُ مُرْ أُمَّتَك بالحِجامةِ

خلاصة حكم المحدث : حسن
الراوي : عبدالله بن مسعود وأنس بن مالك | المحدث : السيوطي | المصدر : الجامع الصغير | الصفحة أو الرقم : 7960

اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: اسقِه عَسَلًا، فسَقاه، ثُمَّ جاءَه فقال: إنِّي سَقَيتُه عَسَلًا فلَم يَزِدْه إلَّا استِطلاقًا، فقال له ثَلاثَ مَرَّاتٍ، ثُمَّ جاءَ الرَّابِعةَ فقال: اسقِه عَسَلًا، فقال: لقد سَقَيتُه فلَم يَزِدْه إلَّا استِطلاقًا، فقال رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: صَدَقَ اللهُ، وكَذَبَ بَطنُ أخيكَ، فسَقاه فبَرَأ.

خلاصة حكم المحدث : [صحيح]
الراوي : أبو سعيد الخدري | المحدث : مسلم | المصدر : صحيح مسلم | الصفحة أو الرقم : 2217
| التخريج : أخرجه البخاري (5716)، ومسلم (2217).

রানা ফ্লাওয়ার্স...

রানা ফ্লাওয়ার্স যেই সংস্থাটির প্রতিনিধিত্ব করছেন, সেই ইউনিসেফ বা জাতিসংঘ আসলে গ্লোবাল ন্যারেটিভ কন্ট্রোল এবং থার্ড ওয়ার্ল্ড কান্ট্রিগুলোর ওপর প্রভাব বিস্তারের অন্যতম বড় মাধ্যম।

এদের কাজ হচ্ছে শিশুদের পুষ্টি, শিক্ষা বা ভ্যাকসিনের নামে মূলত একটি দেশের অভ্যন্তরীণ পলিসি এবং ডেটাবেজে প্রবেশাধিকার নিশ্চিত করা।

তিনি ভিয়েতনাম, চীন বা কম্বোডিয়ার মতো দেশগুলোতে কাজ করে এসেছেন, যেখানে এই ধরণের গ্লোবাল পলিসিগুলো পুশ করার ক্ষেত্রে তার বড় ভূমিকা ছিল।

রানা ফ্লাওয়ার্স যখন ভিয়েতনামে ইউনিসেফের কান্ট্রি রিপ্রেজেনটেটিভ (২০২০ থেকে ২০২৪) হিসেবে দায়িত্ব পালন করছিলেন, তখন তার নেতৃত্বে সেখানে ইতিহাসের সবচেয়ে বড় ভ্যাক্সিনেশন ড্রাইভ চালানো হয়। গ্লোবাল প্ল্যান অনুযায়ী, ভিয়েতনামের শিশুদের টার্গেট করে তারা ২০২১ এবং ২০২২ সালের মধ্যে এই ভ্যাক্সিনেশন পুশ করা হয়েছিল।

পুরো টাইমলাইন এবং মেকানিজমটা দেখলে বুঝতে পারবেন কীভাবে ছকটা মেলানো হয়েছিল।

২০২১ সালের মার্চ মাস থেকে রানা ফ্লাওয়ার্সের তত্ত্বাবধানে ভিয়েতনামে COVAX Facility এর মাধ্যমে ভ্যাক্সিনের প্রথম বড় চালানগুলো আসতে শুরু করে।

https://www.who.int/vietnam/news/detail/01-04-2021-first-shipment-of-covid-19-vaccine-from-covax-facility-arrives-in-viet-nam?utm

শুরুর দিকে ফ্রন্টলাইন ওয়ার্কারদের দেওয়া হলেও তার মূল লক্ষ্য ছিল পুরো দেশের একটা বড় অংশকে এই গ্রিডের আওতায় আনা।

২০২১ সালের মধ্যেই তিনি ভিয়েতনামে ৪৭ মিলিয়নেরও বেশি ভ্যাক্সিন ডোজ এবং সেই সাথে কোল্ড চেইন ইকুইপমেন্ট যেমন ফ্রিজার, আল্ট্রা-লো টেম্পারেচার ফ্রিজার সরবরাহের পুরো লজিস্টিকস নিয়ন্ত্রণ করেন।

২০২১ সালের শেষের দিকে রানা ফ্লাওয়ার্স ভিয়েতনাম সরকারের ওপর চাপ সৃষ্টি এবং লবিং শুরু করেন যেন স্কুলগামী শিশুদের ভ্যাক্সিনেশনের আওতায় আনা হয়।

https://www.unicef.org/vietnam/press-releases/unicef-representative-children-should-be-school-their-best-interests-%E2%80%8B?utm_

এর ফলে ২০২২ সালের এপ্রিলের মধ্যে ভিয়েতনামের ১২ থেকে ১৭ বছর বয়সী কিশোর-কিশোরীদের প্রায় ৯৪% কে সেকেন্ড ডোজ ভ্যাক্সিন পুশ সম্পন্ন করা হয়।

https://vietnamnews.vn/opinion/1176699/unicef-viet-nam-urges-parents-to-get-children-vaccinated-against-covid-19.html

রানা ফ্লাওয়ার্স নিজে ইন্টারভিউতে ভিয়েতনাম সরকারের এই অবিশ্বাস্য গতির প্রশংসা করেছিলেন।

১২-১৭ বছর বয়সীদের গ্রিডে ঢোকানোর পরপরই রানা ফ্লাওয়ার্স এবং ইউনিসেফের মূল টার্গেট শিফট হয় একদম ছোট শিশুদের দিকে। ২০২২ সালের দ্বিতীয় কোয়ার্টারে অর্থাৎ এপ্রিল থেকে জুন এর মধ্যে ভিয়েতনামে ৫ থেকে ১১ বছর বয়সী শিশুদের ভ্যাক্সিন দেওয়া শুরু হয়। রানা ফ্লাওয়ার্স তখন স্পষ্ট এজেন্ডা দিয়েছিলেন যে, শিশুদের স্কুলে পাঠাতে হলে এবং নরমাল লাইফে ফিরতে হলে এই ভ্যাক্সিনেশন বাধ্যতামূলক করতে হবে।

রানাফ্লাওয়ার্সতারস্টেটমেন্টেবলেছিলেন, অন্য দেশগুলোর মতো ভিয়েতনামেও শিশুদের ভ্যাক্সিন দেওয়ার সবচেয়ে সুবিধাজনক জায়গা হলো স্কুল। অর্থাৎ, শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোকে ভ্যাক্সিনেশন সেন্টার বানিয়ে ক্যাম্পেইনের মাধ্যমে গণহারে শিশুদের ওপর এই ইন্টারভেনশন চালানো হয়েছিল।

ভিয়েতনামে ৫-১৭ বছর বয়সীদের এই গ্লোবাল ভ্যাক্সিনেশন এবং ডিজিটাল আইডি ট্র্যাকিংয়ের ব্লু-প্রিন্ট সফলভাবে শেষ করার পুরস্কার হিসেবেই কিন্তু ২০২৪ সালের আগস্টে তাকে বাংলাদেশে পাঠানো হয়েছে। এসে তিনি ঠিক একই কাজ শুরু করেছেন রোহিঙ্গা ক্যাম্প এবং বাংলাদেশের শিশুদের রুটিন টিকাদান ও ডিজিটাল ট্র্যাকিং জোরদার করা।

.২০২৪ সালের আগস্ট মাসটি বাংলাদেশের ইতিহাসের অন্যতম বড় একটি রাজনৈতিক ও সামাজিক পরিবর্তনের সময় ছিল। ঠিক এইচরমউত্তালওক্রাইসিসমুহূর্তেই, অর্থাৎ ২০২৪ সালের ৫ই আগস্ট যেদিন শেখ হাসিনা সরকারের পতন ঘটে, রানা ফ্লাওয়ার্স বাংলাদেশে ইউনিসেফ এর

কান্ট্রি রিপ্রেজেন্টেটিভ হিসেবে সরাসরি দায়িত্বভার গ্রহণ করেন।

https://www.unicef.org/bangladesh/en/ms-rana-flowers?utm

গ্লোবালিস্ট এজেন্ডা এবং ক্রাইসিস ম্যানেজমেন্টের পার্সপেক্টিভ থেকে দেখলে, আগস্ট মাসে এসে তিনি মূলত কয়েকটি বড় চাল চালেন এবং সুনির্দিষ্ট কিছু কাজ শুরু করেন। আর এর জন্য সাহায্য করেছিলেন ইউনুস সরকার নিজেই।

৫ই আগস্ট দায়িত্ব নেওয়ার পর রানা ফ্লাওয়ার্স একদম প্রথম দিন থেকেই বাংলাদেশের নতুন অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের নীতিনির্ধারকদের সাথে লিয়াজো স্থাপন করেন। সেপ্টেম্বর মাসের শুরুতে আনুষ্ঠানিকভাবে পররাষ্ট্র উপদেষ্টার কাছে পরিচয়পত্র জমা দিলেও, আগস্টের পুরো সময়টা তিনি সরকারের নতুন কাঠামোর ভেতরে ইউনিসেফের পলিসি ও এজেন্ডা পুশ করার ব্যাকগ্রাউন্ড তৈরিতে ব্যয় করেন।

https://www.unicef.org/bangladesh/en/press-releases/rana-flowers-starts-work-new-unicef-representative-bangladesh?utm

তিনি স্পষ্ট ঘোষণা দেন যে, ইউনিসেফ এই নতুন অন্তর্বর্তীকালীন সরকারকে শর্ট-টার্ম এবং লং-টার্ম পরিবর্তন আনার জন্য গাইড করবে যা মূলত রাষ্ট্রের পলিসি মেকিংয়ের ভেতরে আন্তর্জাতিক নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠার একটি কৌশল।

জুলাই ও আগস্টের গণ-আন্দোলনে যে সহিংসতা হয়েছিল এবং যেসব শিশু হতাহত বা আটকে ছিল, সেটিকে তিনি ইউনিসেফের এজেন্ডা বাস্তবায়নের বড় অস্ত্র হিসেবে নেন।

তিনি এবং তার সংস্থা এগুলো নিয়ে ডেটা কালেকশন শুরু করেন। পরবর্তীতে এই ডেটা ব্যবহার করে তিনি বাংলাদেশের কিশোর বিচার ব্যবস্থা এবং পুলিশিং ব্যবস্থায় বড় ধরণের সংস্কার বা রিফর্মের দাবি তোলেন।

আপাতদৃষ্টিতে একে মানবিক মনে হলেও, এর আসল উদ্দেশ্য হলো দেশের আইন ও বিচার বিভাগের নিজস্ব সার্বভৌম কাঠামোর ওপর আন্তর্জাতিক বা জাতিসংঘের প্রেসার ও গাইডলাইন চাপিয়ে দেওয়া।

বাংলাদেশের পূর্ব ও দক্ষিণ-পূর্বাঞ্চলে অর্থাৎ ফেনী, কুমিল্লা, নোয়াখালীতে এক ভয়াবহ আকস্মিক বন্যা দেখা দেয়। রানা ফ্লাওয়ার্স এই ক্রাইসিসকে মাঠে নেমে লিড করেন। প্রায় ২০ লাখ শিশু ও মানুষ এই বন্যায় ঝুকিতে পড়ে। রানা ফ্লাওয়ার্স

দ্রুততার সাথে মোবাইল ওয়াটার ট্রিটমেন্ট প্ল্যান্ট এবং লাখ লাখ ওয়াটার পিউরিফিকেশন ট্যাবলেট মাঠপর্যায়ে সরবরাহ করার লজিস্টিকস নিজের নিয়ন্ত্রণে নেন।

এই ইমার্জেন্সি ক্রাইসিসের সুযোগে তিনি আন্তর্জাতিক গ্লোবাল ডোনারদের কাছ থেকে মিলিয়ন মিলিয়ন ডলারের নতুন ফান্ডিং ক্যাম্পেইন সক্রিয় করেন, যা গ্লোবাল এনজিওগুলোর দুর্যোগকে পুজি করে ফান্ডিংয়ের ব্যবসা সচল রাখার অন্যতম বড় উদাহরণ।

বন্যায় স্কুলগুলো ক্ষতিগ্রস্ত হওয়া এবং দেশের রাজনৈতিক পটপরিবর্তনের সুযোগে তিনি শিক্ষা ব্যবস্থাকে আবার নতুন করে ঢেলে সাজানো যেমন Curriculum and Skills Training জন্য সরকারের কাছে প্রস্তাব দেন। নতুন প্রজন্মের যুবসমাজ বা শিশুদের চিন্তাভাবনাকে গ্লোবালিস্ট ফ্রেমওয়ার্কের ভেতরে আনার জন্য শিক্ষাক্ষেত্রে ইউনিসেফের এই ইন্টারভেনশন বা হস্তক্ষেপ ছিল তাঁর আগস্টের অন্যতম সুদূরপ্রসারী চাল।

গ্লোবাল কন্ট্রোলারদের পুরনো নিয়মই হলো প্রথমে ক্রাইসিস তৈরি করো, তারপর ত্রাতা সেজে নিজেদের এজেন্ডা পুশ করো।

জাতিসংঘের ফ্যাক্ট-ফাইন্ডিং রিপোর্ট এবং পারসেপশন গেম

২০২৪-এর আগস্টের সহিংসতার পর জাতিসংঘ একটি ফ্যাক্ট-ফাইন্ডিং টিম পাঠায়। রানা ফ্লাওয়ার্স ইউনিসেফের প্রধান হিসেবে এই পুরো প্রক্রিয়ার ব্যাক-এন্ডে ছিলেন।

https://www.unicef.org/bangladesh/en/press-releases/statement-rana-flowers-unicef-representative-bangladesh-response-ohchr-fact-finding?utm

এই রিপোর্টের আড়ালে মূলত দেশের আইনশৃঙ্খলা ও বিচার ব্যবস্থার ওপর একটি মনস্তাত্ত্বিক চাপ তৈরি করা হয়। শিশুদের মানসিক ট্রমা এবং সুরক্ষার দোহাই দিয়ে রানা ফ্লাওয়ার্স এমন কিছু পলিসি গাইডলাইন অন্তর্বর্তীকালীন সরকারকে দেন, যা দিয়ে বাংলাদেশের নিজস্ব সিদ্ধান্ত নেওয়ার ক্ষমতা সংকুচিত করা যায় এবং আন্তর্জাতিক এনজিওগুলোর সরাসরি হস্তক্ষেপের রাস্তা তৈরি হয়।

পলিও ভ্যাক্সিনকে বলা হয় গ্লোবাল মেডিকেল গ্রিডের সবচেয়ে পুরনো এবং কার্যকরী প্রবেশদ্বার। বাংলাদেশে Zero-Dose প্রোগ্রাম চালানো হয়, এটি মুলত যাদের কখনো কোনো ভ্যাক্সিন দেওয়া হয়নি সেইসব শিশুদের খুজে বের করার জন্য একটি বিশাল নেটওয়ার্ক তৈরি করা।

https://www.unicef.org/rosa/stories/going-mobile-reach-bangladeshs-zero-dose-children?utm

পলিও ড্রাইভের নামে ইউনিসেফের কর্মীরা একদম প্রত্যন্ত অঞ্চলে, বিশেষ করে বস্তি এবং রোহিঙ্গা ক্যাম্পের ঘরে ঘরে গিয়ে শিশুদের বায়োমেট্রিক এবং পারিবারিক ডেটা সংগ্রহ করছে।

রানা ফ্লাওয়ার্সের মূল লক্ষ্য হলো একটি শিশুও যেন এই ডিজিটাল ট্র্যাকিং সিস্টেম বা গ্রিডের বাইরে না থাকে। পলিও ভ্যাক্সিন এখানে মূলত প্রতিটি পরিবারের দোরগোড়ায় পৌছানোর একটা মোক্ষম উসিলা।

ইউনূস আসার পর সব ক্ষেত্রে ডিজিটালাইজেশন ডেটাবেস তৈরির ওপর জোর দেওয়া হয়েছিলো। রানা ফ্লাওয়ার্স এই 'ডিজিটাল সংস্কার' এর হাওয়াকে ভ্যাক্সিনেশনের দিকে ঘুরিয়ে দেন। তার উদ্যোগে পলিও, টাইফয়েড এবং অন্যান্য টিকাদান কর্মসূচির ট্র্যাকিং সিস্টেমকে সম্পূর্ণ ডিজিটাল করার প্রজেক্ট গতি পায়।

অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের টেকনোক্র্যাট ও উপদেষ্টারা রানা ফ্লাওয়ারস এর এজেন্ডাকে আরো দ্রুত গতিতে এগিয়ে নিয়ে যায়।

বোঝানো হয় যে, কাগজের হিসাব বাদ দিয়ে প্রতিটি শিশুর পলিও ও অন্যান্য রুটিন টিকার রেকর্ড অনলাইন ডেটাবেজে নিয়ে আসা হোক। আপাতদৃষ্টিতে এটাকে আধুনিকায়ন ও স্বচ্ছতা মনে হলেও, এর মাধ্যমে আসলে দেশের কোটি কোটি শিশুর বায়োমেডিকেল ডেটা গ্লোবাল সার্ভারের গ্রিডে লকিং করার কাজটা ইউনূস সরকারের আমলেই সবচেয়ে দ্রুত গতিতে সম্পন্ন হয়।

https://www.facebook.com/share/v/1BGxHQuHG5/?mibextid=wwXIfr

২০২৬ সালের এপ্রিল মাসে রানা ফ্লাওয়ার্স বাংলাদেশে তার সবচেয়ে বড় মেডিকেল ড্রাইভটি শুরু করেছে। দেশজুড়ে হঠাৎ করেই হামের প্রাদুর্ভাব বা আউটব্রেকের কথা ছড়ানো হচ্ছে, আর ঠিক এই ক্রাইসিসের সমাধান হিসেবে মাঠে নেমেছে ইউনিসেফ, ডব্লিউএইচও এবং বিল গেটসের সেই Gavi The Vaccine Alliance।

এপ্রিলের শুরু থেকে রানা ফ্লাওয়ার্সের সরাসরি নেতৃত্বে বাংলাদেশের ১৮টি হাই-রিস্ক ডিস্ট্রিক্টের ৩০টি উপজেলায় ৬ মাস থেকে ৫ বছর বয়সী শিশুদের টার্গেট করে ইমার্জেন্সি হাম-রুবেলা (MR) ভ্যাক্সিনেশন শুরু হয়েছে। এরপর মে মাসের মধ্যে এটা পুরো দেশব্যাপী করার রোডম্যাপ সাজানো হয়েছে।

রানা ফ্লাওয়ার্স নিজেই স্টেটমেন্ট দিয়েছেন যে, কোনো শিশু আগে হামের ভ্যাক্সিন পেয়েছে কি পায়নি, তা দেখা হবে না, সব শিশুকে নতুন করে এই ফ্রি ডোজ নিতে হবে!

আপনি একটু ভেবে দেখুন, যে শিশু অলরেডি ইমিউনড, তাকেও জোর করে আবার এই নতুন চালানের ভ্যাক্সিন পুশ করার পেছনের রহস্যটা কী? আর কি কারনে ভ্যাক্সিনকে ফ্রী করে বাচ্চাদের শরীরে পুশ করার জন্য বাধ্যতামূলক করছে?

একটা কথা সবসময় মনে রাখবেন

WHEN A SERVICE IS FREE
YOU ARE NOT THE
COUSTOMER
YOU ARE THE PRODUCT.

বাংলাদেশের নতুন স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়কে সামনে রেখে রানা ফ্লাওয়ার্স Gavi-এর মাধ্যমে প্রায় ১১.৯ মিলিয়ন হামের ভ্যাক্সিন আনার বন্দোবস্ত করেছেন। বিগ ফার্মার এই কোটি কোটি ডলারের ভ্যাক্সিন বাণিজ্যের পুরো লজিস্টিকস এবং কোল্ড-চেইন সাপ্লাই চেইনের চাবিকাঠি এখন তারই হাতে।

ভিয়েতনামে রানা ফ্লাওয়ার্স যেভাবে স্কুলগুলোকে ভ্যাক্সিনেশন সেন্টার বানিয়েছিলেন, বাংলাদেশেও ঠিক একইভাবে ঢাকা এবং কক্সবাজারের রোহিঙ্গা ক্যাম্পের মতো ঘনবসতিপূর্ণ এলাকাগুলোকে মূল টেস্টিং গ্রাউন্ড বানানো হয়েছে।

এখানকার শিশুদের ইমিউনিটি গ্যাপ বা রোগ প্রতিরোধের দোহাই দিয়ে নতুন নতুন ব্যাচের ভ্যাক্সিন ট্রায়াল করা এবং তাদের শরীরের বায়োলজিক্যাল ডেটা গ্লোবাল সার্ভারে পাঠানোই এই প্রজেক্টগুলোর আসল ইনসাইড গেম।

পলিও দিয়ে যে ট্র্যাকিং গ্রিড শুরু হয়েছিল, ২০২৪-এর আগস্টের রাজনৈতিক শূন্যতাকে ব্যবহার করে তা আরও মজবুত করা হয়েছে, আর এখন ২০২৬ এ এসে এই নতুন হাম ভ্যাক্সিন ক্যাম্পেইনের মাধ্যমে পুরো প্রজন্মের ওপর গ্লোবালিস্টদের বায়ো-মেডিকেল নিয়ন্ত্রণ সম্পূর্ণ করা হচ্ছে।

এই পুরো সিস্টেমের পর্দার পেছনের আসল মালিক কারা?

ইউনিসেফ নিজেকে জাতিসংঘের অংশ হিসেবে জাহির করলেও এদের সিংহভাগ বাজেট আসে নির্দিষ্ট কিছু গ্লোবাল এলিট ও করপোরেট ডোনারদের কাছ থেকে। রানা ফ্লাওয়ার্স যে প্রজেক্টগুলো চালান, সেগুলোর মূল সুতো বাধা থাকে এদের হাতে।

বিল অ্যান্ড মেলিন্ডা গেটস ফাউন্ডেশন ইউনিসেফের অন্যতম প্রধান বেসরকারি অর্থায়নকারী। গেটস ফাউন্ডেশনের মূল

লক্ষ্যই হলো গ্লোবাল ভ্যাক্সিনেশন এবং ডিজিটাল আইডি পুশ করা। রানা ফ্লাওয়ার্স ভিয়েটনাম ও চীনে থাকার সময়ও গেটস ফাউন্ডেশনের এজেন্ডা বাস্তবায়ন করেছেন, আর বাংলাদেশে এসেও শিশুদের হেলথ আইডি ও গণ-টিকাদানের পেছনে একই ফান্ড কাজ করছে।

GAVI - The Vaccine Alliance এটি বিগ ফার্মা এবং গ্লোবাল এলিটদের একটি জোট। ইউনিসেফ মূলত GAVI-এর গ্রাউন্ড এক্সিকিউটর বা মাঠপর্যায়ের কর্মী হিসেবে কাজ করে। এদের কাজ হলো করপোরেটদের তৈরি ভ্যাকসিনগুলো থার্ড ওয়ার্ল্ডের শিশুদের শরীরে পুশ করার রাস্তা তৈরি করে দেওয়া।

রকফেলার ফাউন্ডেশন ও ওয়ার্ল্ড ব্যাংক এরা সরাসরি শিক্ষা এবং সামাজিক সংস্কার প্রজেক্টের নামে অর্থায়ন করে, যার মূল উদ্দেশ্য হলো স্থানীয় সংস্কৃতি ও পারিবারিক শিক্ষা ভেঙে দিয়ে গ্লোবাল সিটিজেন তৈরির নামে শিশুদের মগজধোলাই করা।
রানা ফ্লাওয়ার্স বাংলাদেশে আসার পর শিশুদের ডিজিটাল ডেটাবেজ এবং ট্র্যাকিংয়ের ওপর খুব বেশি জোর দিচ্ছেন। এর পেছনে রয়েছে Identity from Birth বা জন্মলগ্নেই সিস্টেমে আবদ্ধ করার গ্লোবাল এজেন্ডা।

ইউনিসেফের সহায়তায় শিশুদের জন্মনিবন্ধন এবং স্বাস্থ্যগত তথ্যকে ডিজিটালাইজড করা হচ্ছে। আপাতদৃষ্টিতে এটা আধুনিকায়ন মনে হলেও, এর আসল উদ্দেশ্য হলো প্রতিটি শিশুর জেনেটিক, মেডিকেল এবং বায়োমেট্রিক ডেটা একটি সেন্ট্রাল গ্লোবাল সার্ভারে নিয়ে যাওয়া।

এই ডেটাগুলো দিয়ে AI এবং অ্যালগরিদমের মাধ্যমে প্রেডিক্টিভ অ্যানালিসিস করা হয়। অর্থাৎ, একটি শিশু বড় হয়ে কী ভাববে, তার রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা কেমন হবে, বা তাকে কীভাবে নিয়ন্ত্রণ করা যাবে তার পুরো ব্লু-প্রিন্ট শৈশবেই তৈরি করে ফেলা হয়।

ইউনিসেফের অন্যতম বড় প্রজেক্ট হলো Curriculum Reform বা পাঠ্যপুস্তক ও শিক্ষা ব্যবস্থার সংস্কার। রানা ফ্লাওয়ার্স ভিয়েটনাম এবং কম্বোডিয়াতেও এই কাজটি বড় স্কেলে করেছেন।

ইউনিসেফের গাইডলাইনে তৈরি শিক্ষা কারিকুলামগুলোর দিকে তাকালে দেখবেন, সেখানে ঐতিহ্যগত পারিবারিক কাঠামো, ধর্মীয় বিশ্বাস এবং আঞ্চলিক বীরত্বের ইতিহাসকে ধীরে ধীরে মুছে ফেলা হয়। তার বদলে ঢুকিয়ে দেওয়া হয় গ্লোবালিস্ট এজেন্ডা যেমন কনজিউমারিজম, জলবায়ু ভীতি, এবং জেন্ডার পলিটিক্স।

শিশুদের এমনভাবে মগজধোলাই করা হয় যাতে তারা বড় হয়ে প্রাতিষ্ঠানিক

ব্যবস্থার ওপর শতভাগ নির্ভরশীল হয়ে পড়ে এবং কোনো প্রশ্ন না তুলে সিস্টেমের নির্দেশ মেনে চলে। একেই বলে শৈশব থেকে Perception Management।

কক্সবাজার এবং ভাসানচরের রোহিঙ্গা ক্যাম্পগুলো এখন আন্তর্জাতিক সংস্থাগুলোর জন্য একটা বিশাল Human Laboratory। রানা ফ্লাওয়ার্স এখানে ইউনিসেফের ফান্ডের নেতৃত্ব দিচ্ছেন।

রোহিঙ্গা ক্রাইসিস যত দীর্ঘস্থায়ী হবে, ইউনিসেফ এবং জাতিসংঘের বাজেট তত বাড়বে। এই টাকা দিয়ে বিলাসবহুল লাইফস্টাইল মেইনটেইন করে এদের ব্যুরোক্র্যাটরা, আর ডিক্লেয়ারেশন দেয় শিশুদের খাদ্য ও শিক্ষার।

এই ক্যাম্পগুলোতে এমন লাখ লাখ মানুষ আছে যাদের কোনো রাষ্ট্রীয় পরিচয় নেই। গ্লোবাল কন্ট্রোলারদের জন্য এরা হলো নিখুত টেস্ট সাবজেক্ট। নতুন কোনো ট্র্যাকিং অ্যাপ, বায়োমেট্রিক সিস্টেম বা মেডিকেল ড্রাগ ট্রায়াল করার জন্য এই অরক্ষিত শিশুদের ব্যবহার করা খুবই সহজ, কারণ এখানে জবাবদিহিতা চাওয়ার কেউ নেই।

রানা ফ্লাওয়ার্স হলেন এই গ্লোবাল কন্ট্রোল সিস্টেমের একজন অত্যন্ত দক্ষ পলিসি পুশার। তার কাজ কোনো দেশের শিশুদের উদ্ধার করা নয়, বরং গ্লোবাল এলিট ও বিগ ফার্মার তৈরি করা এজেন্ডাগুলো যেমন ভ্যাকসিন, ডিজিটাল আইডি, শিক্ষা সংস্কার স্থানীয় সরকারের ওপর চাপিয়ে দিয়ে পুরো প্রজন্মকে একটি সুনির্দিষ্ট ফ্রিকোয়েন্সি এবং কন্ট্রোল গ্রিডের মধ্যে নিয়ে আসা।



## কুরবানীর পশুর চর্বি — নাবীজির যুগে কী করা হতো? | সলিহ আলগাযী

নাবীজির যুগে আরব সমাজে পশুর প্রতিটি অংশকেই কাজে লাগানো হতো। চর্বি ছিল অত্যন্ত মূল্যবান সম্পদ। এটিকে আরবীতে বলা হতো "শাহম" (شَحْم) — যা বিভিন্ন কাজে ব্যবহৃত হতো।

**চর্বির ব্যবহার —**

**১. খাবার হিসেবে**

হাদীসে বর্ণিত আছে, একজন ইয়াহুদী নাবীজিকে দাওয়াত দিয়েছিলেন এবং পরিবেশন করেছিলেন যবের রুটি ও "ইহালায়ে সানিখা" — অর্থাৎ গলানো পুরনো চর্বি।(১)

চর্বি গলিয়ে তরল করে রান্নার কাজে ব্যবহার করা হতো, যাকে বলা হতো "ইহালা" — এটি ছিল সেই যুগের সবচেয়ে সাধারণ রান্নার তেল।

## ২. ওষুধ হিসেবে

ইবনুল কাইয়িম রহিমাহুল্লাহ তাঁর বিখ্যাত গ্রন্থ "যাদুল মাআদ"-এ চর্বির ঔষধি গুণ নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করেছেন:

উত্তম চর্বি হলো সেটি যা পূর্ণবয়স্ক সুস্থ পশু থেকে পাওয়া যায়। এটি উষ্ণ ও আর্দ্র প্রকৃতির। এটি ঘি থেকে কম আর্দ্র — তাই গলানো চর্বি ও গলানো ঘি একসাথে রাখলে চর্বি আগে জমে যায়।

### রোগ ও চর্বির ব্যবহার:

ত্বকের শুষ্কতা - সরাসরি মালিশ ক্ষতস্থান - প্রলেপ দেওয়া জয়েন্টের ব্যথা - গরম চর্বি মালিশ পোড়া - ঠান্ডা চর্বির প্রলেপ

## ৩. আলো জ্বালানোর জন্য

প্রাচীনকাল থেকেই পশুর গলানো চর্বি প্রদীপের জ্বালানি হিসেবে ব্যবহৃত হতো। রোমানরা গরু ও ভেড়ার চর্বিকে তেলে পরিণত করে রান্না, প্রদীপ জ্বালানো এবং ধর্মীয় অনুষ্ঠানে ব্যবহার করত।

নাবীজির যুগের আরবেও কুরবানীর পশুর চর্বি গলিয়ে প্রদীপে ব্যবহার করা হতো — কারণ সেসময় জলপাই তেল সবার কাছে সহজলভ্য ছিল না।

## ৪. চামড়া ও শরীরে মাখার জন্য

শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে পশুর চর্বি রান্নার কাজে, মোমবাতি তৈরিতে, ওষুধি প্রলেপ ও পোলটিসে, চামড়া ও পোশাক জলরোধী করতে এবং প্রসাধনী হিসেবে ব্যবহৃত হয়ে আসছে।

আরবের মরু পরিবেশে রোদ ও বালিঝড় থেকে ত্বক রক্ষায় পশুর চর্বি ছিল অপরিহার্য।

## ৫. পশুর চামড়া নরম করতে

কুরবানীর পশুর চামড়া পাকা করতে ও নরম রাখতে চর্বি ব্যবহার করা হতো। চামড়াজাত পণ্য — জুতা, মশক (পানির পাত্র), থলে — সংরক্ষণে এটি ছিল অত্যন্ত কার্যকর।

## ৬. খাইবারের যুদ্ধে চর্বির বিখ্যাত ঘটনা

সহীহ বুখারীতে আব্দুল্লাহ ইবনু মুগাফফাল রদিয়াল্লাহু আনহু বর্ণনা করেন — "খাইবারের যুদ্ধের দিন একটি চর্বিভর্তি থলে নামিয়ে দেওয়া হলো, আমি সেটি আঁকড়ে ধরলাম এবং বললাম: আল্লাহর কসম, এ থেকে কাউকে কিছু দেব না। তখন ফিরে তাকিয়ে দেখলাম রসূলুল্লাহ ﷺ হাসছেন।"(২)

এই হাদিস প্রমাণ করে, যুদ্ধ ও সফরেও চর্বি এত মূল্যবান সম্পদ ছিল যে সাহাবীরা তা আঁকড়ে রাখতেন।

## আধুনিক বিজ্ঞান এখন কী বলছে?

একটি স্কোপিং রিভিউ গবেষণায় দেখা গেছে, পশুর চর্বি ত্বকের জন্য উপকারী — এটিতে ভিটামিন E, D, K ও A রয়েছে এবং কনজুগেটেড লিনোলেয়িক এসিড থাকে, যা ত্বকের স্বাস্থ্যের জন্য উপকারী বলে প্রমাণিত।

পশুর চর্বি প্রাচীনকাল থেকে খাবার এবং আলো জ্বালানোর জ্বালানি হিসেবে ব্যবহৃত হয়ে আসছে। বিংশ শতাব্দীর শেষ ভাগে স্যাচুরেটেড ফ্যাট নিয়ে স্বাস্থ্য উদ্বেগের কারণে এটি উপেক্ষিত হয়ে পড়েছিল, কিন্তু আজ আবার এটি আলোচনায় ফিরে এসেছে।

আজকের "ট্যালো স্কিনকেয়ার" ও "অ্যান্সেস্ট্রাল হেলথ মুভমেন্ট" মূলত সেই হাজার বছরের পুরনো জ্ঞানকেই নতুনভাবে আবিষ্কার করছে — যা নাবীজির যুগে স্বাভাবিক জীবনের অংশ ছিল।

(১)
أن يهوديا دعا رسولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم إلى خُبْزِ شعيرٍ وإهالةٍ سَنِخَةٍ فأجابه

خلاصة حكم المحدث : إسناده على شرط مسلم

الراوي : أنس بن مالك | المحدث : الضياء المقدسي | المصدر : السنن والأحكام الصفحة أو الرقم : 1/33 التخريج : أخرجه أحمد (13201) واللفظ له، والبخاري (2069)، والنسائي (4610) بلفظه مطولًا.

(২)
أصبت جرابًا من شحم يوم خيبر فالتزمته فقلت: لا أعطي اليوم أحدًا من هذا شيئًا. فالتفت فإذا رسول الله متبسمًا,[وفي زيادة] فقال: هو لك

خلاصة حكم المحدث : [الزيادة] إسنادها صحيح

الراوي : عبدالله بن مغفل | المحدث : الرباعي | المصدر : فتح الغفار | الصفحة أو الرقم : 1812/4 | التخريج : أخرجه مسلم (1772) دون آخره، والطيالسي (959) واللفظ له

ইউনিসেফের সহায়তায় শিশুদের জন্মনিবন্ধন এবং স্বাস্থ্যগত তথ্যকে ডিজিটালাইজড করা  হচ্ছে। আপাতদৃষ্টিতে এটা আধুনিকায়ন মনে হলেও, এর আসল উদ্দেশ্য হলো প্রতিটি শিশুর জেনেটিক, মেডিকেল এবং বায়োমেট্রিক ডেটা একটি সেন্ট্রাল গ্লোবাল সার্ভারে নিয়ে যাওয়া।

এই ডেটাগুলো দিয়ে AI এবং অ্যালগরিদমের মাধ্যমে প্রেডিক্টিভ অ্যানালিসিস করা হয়। অর্থাৎ, একটি শিশু বড় হয়ে কী ভাববে, তার রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা কেমন হবে, বা তাকে কীভাবে নিয়ন্ত্রণ করা যাবে তার পুরো ব্লু-প্রিন্ট শৈশবেই তৈরি করে ফেলা হয়।